International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 282-295
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.222

ননী ভৌমিকের গল্পে মারি ও মড়কের আর্তরব: একবুক দীর্ঘশ্বাসের বিষবাষ্প

মহেন্দ্র নাথ পাল

গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Among the numerous calamities and disasters that have repeatedly devastated Bengal, famine and starvation stand out as the most significant. The dark clouds of famine have repeatedly gathered over the skies of the lives of the people of Bengal. And in those moments, as their existence was torn asunder, even the steady, slow rhythm of their daily lives came to a complete standstill. The brutal impact of the Bengal Famine of the 1940s – the 'Panchasher Manwantar' – fundamentally altered the landscape of life for both Bengal and its people. Lamentation and anguish filled every household; deprived of food and subsisting on starvation rations, thousands of people were then on the brink of death. The emaciated bodies of the barely living became fodder for jackals and vultures. Villages emptied out as people migrated to the cities. Driven by the desperate hope of merely sustaining life, they sought to survive as pavement-dwellers and parasites on the city streets. In this turbulent phase of lives swept away by the current of events, they consumed even the most inedible and repulsive substances simply to stay alive. The villages of Bengal were transformed into desolate graveyards. This harrowing imagery of a Bengal held captive by death has been vividly and extensively portrayed in Bengali fiction, particularly in the short stories of Noni Bhoumik. With a journalistic precision, yet imbued with meticulous artistic brilliance, the author presents to the reader the various facets of famine and pestilence – and the dark, hidden recesses of suffering born from their devastating impact. Through his various stories, he also brings to light the underlying, man-made causes of these famines and epidemics – causes that often lie concealed within the annals of history. Noni Bhoumik demonstrates in several of his short stories the historical truth that the hoarding of grain by capitalists and moneylenders was a primary factor that significantly exacerbated this famine. The famine also loosened the bonds of familiar human relationships, causing individuals to stray from the cherished values they had long upheld. Men capable of earning a livelihood abandoned their wives, children, and families, driven solely by the imperative of self-preservation. Confronted by the harsh realities of existence, the characters in Noni Bhoumik's stories repeatedly found themselves prioritizing their own primal instinct for survival above all else. Conversely, in some of these stories, we observe that in their desperate struggle to survive the catastrophe – regardless of caste, creed, or religion – people retreated deeper into the embrace of conservative religious rituals and beliefs. Ultimately, having failed to fulfill even their most basic human needs for sustenance and survival, people turned into their own worst enemies. Within the human psyche, a bestial rage – a murderous instinct – has awakened. Conversely, certain representatives of the capitalist world – individuals blinded by self-interest and consumed by a predatory lust for women – have sought to exploit the plague and pestilence as a pretext to gratify their sexual cravings. The author portrays this devastating epidemic not merely as a localized phenomenon, but across the entire expanse of Bengal – encompassing the South, the Rarh region, and even the North – while also vividly depicting its profound impact on the lives of tea plantation

*workers. Yet, Noni Bhoumik's stories are not confined solely to being vignettes of human misery; rather, they occasionally ignite the latent embers of resistance – a theme that emerges distinctly in several of these narratives. Thus, standing amidst the desolate, charnel-ground landscape of famine-stricken rural Bengal, the various stories within Noni Bhoumik's collection **'Dhankana'** weave a poignant chronicle of the plague – one that ultimately manifests as the collective, heart-rending sigh and anguished cry of a Bengal ravaged by pestilence.*

Keywords: Death-stricken villages, The Quest for Survival in the City, illicit Hoarding, The class of Moneylenders and Capitalists, Sexual Lust, The Erosion of Traditional Values, Conservative religious Beliefs, The Thirst for Life, The Pervasive Onslaught of Famine, Passive Resistance.

"মানুষ এবং কুত্তাতে
আজ সকলে অন্ন চাটি একসাথে,
আজকে মহাদুর্দিনে
আমরা বৃথা খাদ্য খুঁজি ডাস্টবিনে ।"[১]–

-অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান এই তিনটি ন্যূনতম চাহিদাই মানুষের জীবনপ্রবাহের প্রাথমিক ভিত্তি। এই তিনটি জীবনরসদের উপর ভিত্তি করেই গুহাবাসী মানুষ তার প্রাগৈতিহাসিক জীবনচর্যা পরিহার করে সভ্য হয়েছে। 'সভ্যতা' শব্দটির সঙ্গে মিশে আছে মানুষের সুস্থিত জীবনবোধ। কিন্তু হঠাৎ আকস্মিক বিপর্যয়ে সেই সুস্থতায় ছেদ পড়লে, ছন্দপতন ঘটে মানুষের স্বাভাবিক জীবন-ঐতিহ্যে। তখন যন্ত্রণাহত দুর্যোগ ও আঘাতে গতিহীন হয়ে পড়ে মানুষের সচল ও স্বতঃস্ফূর্ত জীবনছন্দ। দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর মানবসভ্যতা ও সমাজে নেমে আসা এমনই এক অভিশাপ। যে দুর্বিপাকের অবশ্যম্ভাবী ফল মারি ও মড়ক। বাংলার আকাশে এমন করেই বারবার নেমেছে দুর্ভিক্ষের শকুন। তার মধ্যে দুটি মন্বন্তর বাংলার জাতীয় জীবনের শিরদাঁড়া একেবারে ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল। যে বৃহত্তর বিপর্যয়ে বাংলা হয়ে উঠেছিল শ্মশানের বেলাভূমি। বাংলার বুকে ঘটে যাওয়া এমন দুই ভয়ংকর দীর্ঘশ্বাসের নাম ১৭৭০ তথা ১১৭৬ বঙ্গাব্দের ও ১৯৪৩ তথা ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ ও মহামারি। যা এক নিঃশ্বাসে দমকা হাওয়ার মতোই বাংলার সুসজ্জিত গৃহকোণকে পরিণত করেছিল মহাশ্মশানে। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়টি পঞ্চাশের মন্বন্তরকেন্দ্রিক।

১৩৫০-এর বাংলায় রক্তক্ষয়ী মহামন্বন্তরের কারণটি ছিল যতটা না প্রাকৃতিক, তার চেয়ে অনেক বেশি মনুষ্যসৃষ্ট। বাংলার পুঁজিপতি, মুনাফালোভী, মহাজন শ্রেণির মানুষ অতিরিক্ত খাদ্যশস্য গুদামজাতকরণের ফলে বাজারে বপন করেছিল কৃত্রিম মন্দা বা খাদ্যাভাবের বীজ। একদল নরপশুদের এই সীমাহীন অর্থলিপ্সা ও অমানবিক মনোভাবই বাংলাকে দুর্ভিক্ষের চৌকাঠে মুখ থুবড়ে ফেলেছিল। তখন থেকেই মানুষের পশুবৎ দিনযাপনের পালা। অন্নাভাবে, অর্ধাহারে, অনাহারে মানুষের কুখাদ্যগ্রহণের তাগিদ। আর সর্বোপরি খাদ্যহীনতায় রাশি রাশি কঙ্কালসার দেহ। মৃত্যু, বুকফাটা হাহাকার, চিল-চিৎকারের মতো কান্না ও মহাশ্মশান দৃশ্য দিয়েই সম্পূর্ণ হল পঞ্চাশের মড়কের সেই কালো ইতিবৃত্তটা। কিছু অর্থসর্বস্ব মানুষের মানবতার হানিই সেদিন এত মানবহানি ঘটাল। এতসংখ্যক জীবনহানি ও আকস্মিক মৃত্যুর দাম দেবে কে? সেদিন স্রেফ মানুষেরই তৈরি করা মন্বন্তরে ইতিহাসের তিরিশ লক্ষ বাঙালি মা-বাবা-ভাই-বোনকে না-খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক মানস মজুমদার তাঁর 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তর-চিত্র' প্রবন্ধে বলেছেন –

> "এ মন্বন্তর মূলত মানুষের সৃষ্টি। মুনাফালোভের মজুতদার ও কালোবাজারীর দল খাদ্যশস্যের এই কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল।"[২]

–তারই প্রতিফল এই মহামারি ও মড়ক। ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়ে লিখে নিল সব। কালের খতিয়ান সেই রক্তক্ষয়ের কড়চা প্রস্তুত করল। আর সাহিত্য যেহেতু সবচেয়ে বেশি সমাজেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভিঘাতপূর্ণ ফসল; তাই পঞ্চাশের সেই দীর্ঘশ্বাস বাংলা সাহিত্যেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখল। বাংলার বুকে জমাট বাঁধা একরাশ কালো অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠল বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠায়। আর কথাসাহিত্য যেহেতু বর্ণনামূলক সাহিত্য প্রকরণ; সেই জন্য বাংলা কথাসাহিত্যই এই মহামন্বন্তরের সাড়া ফেলল সর্বাধিক। রচিত হতে লাগল অসাধারণ সব শিল্পসমৃদ্ধ গল্প-উপন্যাস। সেই বিক্ষুব্ধ সময়ের পটভূমিকাতেই হাতেখড়ি হল একাধিক কথাসাহিত্যিকের। সেই রক্তক্ষয়ী আবর্তের অন্ধকার সেঁচে হাত পাকানো বহু গল্পকারের। এমনই একজন শক্তপেশির কথাকার হলেন ননী ভৌমিক (১৯২১-১৯৯৬)। যাঁর গল্পে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, মারি ও মড়ক গভীর অভিঘাত রচনা করেছে।

ননী ভৌমিক (১৯২১-১৯৯৬) বাংলা কথাসাহিত্যের বিস্মৃতপ্রায় লেখক। তিনি চিরকালই বাংলা সাহিত্য-সমালোচনাবৃত্তের বাইরে থেকে গেছেন। তাঁকে নিয়ে চর্চার এই কেন্দ্রবিচ্যুতির দায় তাঁর নয়; সে দায় আমাদের। সে ব্যর্থতা ও লজ্জা আমাদের। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন যথেষ্ট শক্তিমান কথাকার বটে। চল্লিশের উত্তাল আবর্তেই তাঁর বাংলা কথাসাহিত্যের আঙিনায় আবির্ভাব। আর তাঁর সেই আবির্ভাব জানান দিয়ে গেল ক্ষয় ও ধ্বংসের ইতিহাসকে সাক্ষী করে। সময়টা যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-মন্বন্তর-খাদ্যাভাবের পটভূমিকায় গল্পকার রূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা। পরিবর্তমান দেশ-কাল-সমাজের আলোড়নেই উত্তাল হয়েছে তাঁর শিল্পীমন, জাগ্রত বিবেক। এ প্রসঙ্গে সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে বলেছেন–
"বস্তুত সেদিন (১৯৩৯-৪৭) কোনো লেখকই পরিবর্তমান সমাজ, ভাঙন ও বিপর্যয় সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারেননি। থাকা সম্ভব ছিল না।" [৩]

–গল্পকার ননী ভৌমিকও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। নিজের মানবদরদী শিল্পচেতনায় তিনি সেদিন সম্পৃক্ত করে নিলেন নিজের কলমের মসি। রচনা করলেন মারি-বিধ্বস্ত মানুষের উপাখ্যান। যা মানুষের যন্ত্রণার দলিল হয়ে শিল্প আবেদনে ঋদ্ধি অর্জন করল। সেই সময়ের বিক্ষুব্ধিই যে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির অনুঘটক, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রাবন্ধিক ও 'গল্পসরণি' পত্রিকার সম্পাদক অমর দে-এর এই উক্তিটি –
"ননী ভৌমিক ছিলেন এক বিক্ষুব্ধ সময়ের সন্তান এবং সেই সময়ের ক্ষোভকেই তিনি সাহিত্যে শৈল্পিকভাবে রূপায়িত করেছেন। তাঁকে হয়ত ঝড়ের পাখিও বলা যেতে পারে।"[৪]

–সেই আন্দোলিত দশকের পট-প্রতিবেশে তাঁর সজাগ দৃষ্টিতে অভিনন্দিত হল একেবারে ভিন্ন জীবনধারার চরিত্ররা। তথাকথিত ভদ্র-ন্যূনবিত্তের বাইরে যে বিপুল সংখ্যক কৃষক-শ্রমিক শ্রেণি; যাদের একটা নির্দিষ্ট পৃথক শ্রেণিগত অবস্থান আছে, ননী ভৌমিকের গল্পে সেইসব চরিত্ররা জীবন্ত হয়ে উঠল। বাংলা কথাসাহিত্যে তাই একটি স্বতন্ত্র রেখাপথ ও ধারা নিয়ে তাঁর হাজির হওয়া।

ননী ভৌমিক মূলত চল্লিশের দশকের গল্পকার। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য ও রাজনৈতিক জীবন অধ্যায়ের প্রস্তুতিপর্ব। বিধ্বস্ত সময়পর্বের ক্রান্তিলগ্নে তিনি ছোটালেন অশ্বমেধের ঘোড়া। রমেশচন্দ্র সেন, সুশীল জানা, নবেন্দু ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, গোলাম কুদ্দুস, সোমনাথ লাহিড়ী, অনিল গোস্বামী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু প্রমুখ একঝাঁক দিকপাল কথাসাহিত্যিকদের সহসঙ্গী হয়েই চল্লিশের দশকে রচিত হতে লাগল তাঁর গল্পগুলি। একই বৃত্তপটে অবস্থান করেও তাঁর গল্পগুলি স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবিদার। তাঁর গল্পগুলি যেন এক একটি ক্যামেরাবন্দী ফটোগ্রাফির এক এক টুকরো কোলাজ। ব্যক্তিজীবনে সাংবাদিক হওয়ার কারণে তাঁর গল্পের সংবাদধর্মী এসেন্স ভিন্নমাত্রা যোগ করল বাংলা গল্পবৃত্তের পরিধিতে। মার্কসবাদী জীবনাদর্শে দীক্ষিত হওয়ার কারণে তাঁর সাহিত্যে সেই সাম্যবাদী বৈপ্লবিক মনোধারা

সম্পৃক্ত হয়েছে কখনো সখনো। তবে কখনোই তাঁর সাহিত্য তাঁর আদর্শের 'প্রোপাগান্ডা' হয়ে ওঠেনি। উদ্দেশ্যমূলকতাকে পরিহার করে প্রোপাগান্ডাধর্মী সাহিত্য রচনা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

"একবার ননীবাবু আমাকে বলেছিলেন যে, দেখুন একজন সাহিত্যিক শিল্পের নিয়ম অনুযায়ী চলবে। এটা মার্কসেরই কথা। ব'লে মার্কস থেকে একটা কোটেশন দিয়ে বলেছিলেন according to the laws of beauty লিখতে হবে।"[৫]

–ননী ভৌমিক সাহিত্যজীবনেও তা মেনে চলেছেন। সমাজমনস্কতা, সময়পীড়িত মানুষের কথা তাঁর গল্পসাহিত্যের উপজীব্য। তবে কথাকার ননী ভৌমিকের সাহিত্যজীবন খুবই স্বল্পদৈর্ঘ্যের। ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত, মাত্র এগারো-বারো বছর। তিনি রচনা করেছেন মোট ছত্রিশটি গল্প ও একমাত্র উপন্যাস 'ধুলোমাটি' (১৯৫৬)। তাঁর এই গল্পসম্ভার মুদ্রিত হয়েছিল মোট চারটি গল্পগ্রন্থে। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ হল 'ধানকানা' (১৯৫৩)। তাঁর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তথা শেষ গল্পগ্রন্থগুলি হল যথাক্রমে 'আগন্তুক' (১৯৫৪), 'পূর্বক্ষণ' (১৯৫৭) ও 'চৈত্রদিন' (১৯৫৮)। এর মধ্যে ননী ভৌমিকের 'ধানকানা' (১৯৫৩) নামক প্রথম গল্পগ্রন্থের একাধিক গল্পে মন্বন্তর ও মারি-মড়কের চালচিত্র অনুসন্ধানই আমাদের মূল অন্বিষ্ট।

'ধানকানা' ননী ভৌমিকের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ। গ্রন্থটি বাংলার ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে তথা ইংরেজির ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস থেকে। গ্রন্থটিতে মোট গল্প আছে দশটি। গল্পগুলির পৃথক পৃথক রচনাকাল হিসেবে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ গ্রন্থের সমস্ত গল্পগুলিই যে ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে রচিত; তা গ্রন্থের সূচনায় বর্ণিত। 'ধানকানা' গ্রন্থপ্রকাশের আগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ননী ভৌমিকের সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। এই গ্রন্থের বেশিরভাগ গল্পগুলিই ১৩৫০ বঙ্গাব্দ তথা ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত। অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের মতো তাঁর গল্পের কলমেও এসে লাগল পঞ্চাশের মারি ও মড়কের আঁচ। যে দুর্যোগে ধ্বস্ত হয়ে উপড়ে গেল মানুষের সুখতন্দ্রা ও স্বচ্ছন্দ জীবনবিধি। অনাহার ও মৃত্যু হয়ে উঠল তাদের একমাত্র জীবনসঙ্গী। এই বিস্মৃতপ্রায় কথাসাহিত্যিক ননী ভৌমিকের সাহিত্য পরিধিকে দুর্ভিক্ষ ও মারি কিভাবে স্পর্শ করে গেল; তাই-ই আমাদের এখনের আলোচ্য। এই 'ধানকানা' গ্রন্থের দশটি গল্পের মধ্যে পাঁচটি গল্পেরই কেন্দ্রক হয়ে উঠেছে পঞ্চাশের সেই রক্তক্ষয়ী হতাশ্বাসপূর্ণ মন্বন্তর ও মৃত্যু। যে মৃত্যু মানেই ধ্বংস-প্রহেলিকা, রক্ত-বিভীষিকা। 'একটি দিন ১৯৪৪', 'কাফের', ' খুনীর ছেলে', 'কেলেপাথরী' ও 'হটাবাহার' – 'ধানকানা' গ্রন্থের এই পাঁচটি গল্পের সাহায্যেই এখন আমরা ননী ভৌমিকের গল্পের মারী ও মড়ক প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করে নেব। যে গল্পগুলিতে মানুষের জীবনচর্যায় একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে কেবল এই কথাগুলি –

"বন্যার হাওয়ার মতো হা-হা করে
দুর্ভিক্ষের ঝড়ে,
আসে মন্বন্তরে
কৃমির উল্লাস নিয়ে শবের ভিতরে –
তবু এরা আসে
এগারোশো ছিয়াত্তরে – তেরশো পঞ্চাশে।"[৬]

'ধানকানা' (১৯৫৩) গ্রন্থের প্রথম গল্প হল 'একটি দিন ১৯৪৪'। গল্পটির অণু-পরমাণুতে মিশে আছে মন্বন্তরের নির্যাস। আকস্মিক দুর্বিপাকে উজাড় হয়ে গেল বাংলার গ্রামকে গ্রাম। পরিপাটি জীবনবোধ ত্যাগ করে নিরন্ন মানুষকে হতে হয়েছে পথচারী। এক টুকরো খাদ্যের খোঁজে সেদিন পরিত্যক্ত ডাস্টবিন, উচ্ছিষ্ট বস্তু-

তাদের কাছে পরম প্রত্যাশিতI এই পটভূমিতে গল্পটি নির্মিতI গল্পটি যেন ১৯৪৪-এর দুর্ভিক্ষপীড়িত দিনের টুকরো টুকরো চিত্রের কোলাজকে গেঁথে তৈরি করা হয়েছে। গল্পের শুরুতেই দেখি–

> "যারা বেঁচেছিল, ছেলে আর বুড়ো- বাংলা সরকার আইন করে খেদিয়ে দিয়েছে তাদের। যারা মরেছে, হাঁড়িকুড়ি কাঁথা কানি সমেত তাদের ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেওয়া হয়েছে।"[৭]

–আসলে এই অনাহার ও মৃত্যুর কারণ তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতা ও পুঁজিপতিদের খাদ্যদ্রব্য মজুতকরণI সেইজন্যই গল্পে দেখি বিপুল পরিমাণ মজুতজাত চাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ফেলে দেওয়া হচ্ছে। অথচ সঠিক সময়ে এই চাল মানুষের কাছে পৌঁছে যায়নি। তা গেলে বাংলা সেদিন মহাশ্মশানের শরিক হয়ে উঠত না। মানুষ যখন সম্পূর্ণ ডুবতে বসে, তখন সে সামান্য খড়কুটোকে আঁকড়ে ধরেও বাঁচতে চায়। সেখানে মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো। তাই গল্পে গয়লা বৌ, কমলা ও মালপাড়ার মধ্যবয়সী আরো তিনজন মেয়ে সেই পচা চাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। তাদের মনে জমাট বেঁধেছে বাঁচার ও জীবনধারণের স্বপ্ন। অথচ এই পাঁচটি মহিলার মধ্যে গয়লা বৌ-ই শারীরিকভাবে একটু সমর্থ হওয়ায় সে-ই লালসালিপ্সু পুরুষের চোখে চাল পাওয়ার অধিকারী হয়ে ওঠে সর্বাগ্রে। অথচ–

> "গয়লা বৌ নেই। সেই যে লোকটার সঙ্গে কোথায় গেল আর ফেরেনি।"[৮]

–অর্থাৎ মানুষের সেই অন্ধকারতম দিনেও মানুষ যেখানে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করছে সমান প্রতিস্পর্ধিতায়; সেখানে তাদের সংকট ও অভাবকেই টোপ বা হাতিয়ার করে একশ্রেণির মানুষের যৌনলালসা ও প্রবৃত্তি - ক্যান্সারগ্রস্ত সমাজের দগ্ধ ক্ষতকে চিনিয়ে দেয়। যে সমাজ বারবার তার কদর্যতার পরিচয় দেয়। ক্ষমতা ও অর্থ যার, যৌনলালসা তার হাতের পুতুল মাত্র। এই গল্প আবার তা প্রমাণ করে। বাকি মেয়েরা এত শ্রমলব্ধ অখাদ্য, পচা চাল ক্ষুধার তাড়নায় চিবিয়ে নেয়। ক্ষুধাকে যারা বেআইনি করেছে, যারা ক্ষুধিতদের আখ্যা দিয়েছে বিপজ্জনক; তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এদের বেঁচে থাকতে হয়। ক্ষুধা যে কি বড় তাড়না সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ তা উপলব্ধি করেছিল।

'একটি দিন ১৯৪৪' গল্পে দেখি শহরের পথে পথে কঙ্কালসার মানুষের মৃত্যু মিছিল। গ্রামের ভাগচাষী, কৃষককে তাই খাদ্যাভাবে, অনাহারে পাগল হ'য়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয় শহরের রাজপথে, ফুটপাথে। মানুষ এতটুকু উচ্ছিষ্ট খাদ্যপ্রাপ্তির আশায় সেদিন আত্মগোপন করেছিল শহরের গলিঘুঁজিতে –

> "ছায়ার ভেতর থেকে নিস্তব্ধভাবে কারা বেরিয়ে আসে তখন। আশেপাশে চারিদিকে চেয়ে দেখে পুলিশ আছে কিনা।"[৯]

-এই দৃশ্যটি চিনিয়ে দেয়- সেদিন মন্বন্তর প্রতিরোধ আইনে মানুষের পথবাসী হওয়াতে সরকার ও পুলিশের নিষেধাজ্ঞা ছিল। তাই মানুষের এত লুকোচুরি। গল্পটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমালোচক বিনতা রায়চৌধুরী তাঁর 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন –

> 'একটি দিন ১৯৪৪' গল্পে মন্বন্তরের অব্যবহিত পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত। মন্বন্তরকালীন সামাজিক পরিবেশের কয়েকটি দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করা হয়েছে। ঘটে যাওয়া ঘটনার কয়েকটি ফটোগ্রাফি যেন।"[১০]

–গল্পটিতে তথাকথিত নিটোল কাহিনী নেই। কয়েকটি খন্ডচিত্রের মত করে দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী যন্ত্রণার দলিল রচনা করতে চেয়েছেন গল্পকার এ গল্পে। সেই টুকরো টুকরো খন্ডচিত্রেই যেন সেদিনের শহরের ভয়াবহ নরকদৃশ্য ও জীবন্ত মানুষের একটু একটু করে মৃত্যুর পথে চালিত হওয়ার আখ্যানটি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। একজন আলোকচিত্রকরের মতো করেই চিত্র সংগ্রহ করে এ গল্পে তিনি পৃথক শৈল্পিক তাৎপর্য বহন করলেন। বিশিষ্ট

কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক সাধন চট্টোপাধ্যায় তাই তাঁর 'বিস্মৃত লেখক ননী ভৌমিক : একটি প্রেমের গল্পের নিবিড় পাঠ' প্রবন্ধে ননী ভৌমিকের গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন–

> "ছোট ছোট বাক্যে ক্যামেরা ঘোরানোর মতো টুকরো টুকরো ছবি জুড়ে, বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত গতিময়তায় ধীরে ধীরে তাঁর গল্পের পটভূমিকাটি আকাশের মতো ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। কাহিনি গ্রাম কি শহর, যেখানেরই হোক না কেন।"[১১]

-এই গল্পটির ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। আসলে কাটাকাটা দৃশ্যের মধ্য দিয়ে এই গল্পটির সংবাদমূল্য অপূর্ব। তবে গল্পটিকে পুরোপুরিই সংবাদধর্মী রচনা বলা হলে গল্পটির প্রতি অবিচার করা হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, এটি কোনো সংবাদপত্রের প্রতিবেদন নয়; আসলে এটি গল্পই। 'বাংলা ছোটগল্পের সব্যসাচী ননী ভৌমিক' নিবন্ধে প্রাবন্ধিক অনন্যশংকর দেবভূতির এই উক্তিটি উল্লেখ করলেই বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে–

> "চল্লিশের দশক থেকেই বাংলা কথাসাহিত্য রাজনীতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে থাকে। গদ্যসাহিত্যে এই লেখা দেখা যায় দু'ধরনের- রিপোর্টাজ ও গল্প-উপন্যাস। রাজনৈতিক রিপোর্টাজকে সাহিত্যিক রূপ দেওয়ার সূচনা সোমনাথ লাহিড়ীর মাধ্যমে।"[১২]

-আর সেই পথেরই পথিক হয়ে এই ধারাটিকে আরো কিছুটা অগ্রসর করতে সচেষ্ট হয়েছেন কথাকার ননী ভৌমিক। তাঁর এই গল্পটি তারই প্রমাণ। সংবাদধর্মী শিল্পরসের সমাবেশে এ গল্পের রসাবেদন এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরং তার সংমিশ্রণে এক নতুনধারার গল্পরীতির জন্ম হয়েছে। এখানেই গল্পটির শিল্পমূল্য। আর ১৯৪৪-এর দুর্ভিক্ষ পীড়িত দিনের খণ্ডচিত্র বর্ণনায় গল্পের নামকরণও লাভ করেছে শিল্পসার্থক রূপ।

'ধানকানা' (১৯৫৩) গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'কাফের'। এই গল্পটিরও পট-পরিবেশ ১৩৫০-এর মারি ও মড়ক। গল্পে দেখি দরিদ্র সাধারণ মানুষ মারি ও মড়ক কবলিত হলেও পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের এতটুকু আর্থিক অসমৃদ্ধি নেই। গল্পে যা মন্বন্তরের সেই ঐতিহাসিক কারণটির প্রতি সংকেত নির্দেশ করে। গ্রামগুলি পরিণত হয়েছে নরভাগাড়ে। সেখানে মানুষের শব বহনের লোক পর্যন্ত নেই। সেই নিঃসীম ভয়ংকর শূন্যতায় গল্পে মড়কের পূর্বাভাসের বীজ এভাবে বপন করেছেন লেখক–

> "গাদা গাদা শকুন উড়ছে আকাশে। মড়কের অগ্রদূত ওরা। যমুনার কোন একটা বাঁকে মরা গরু আর মানুষের মাংস খাওয়ার জন্য সাঁই সাঁই করে উড়ে আসছে।"[১৩]

–'কাফের' গল্পের গণচরিত্রদের মধ্যে অন্যতম প্রধান চরিত্র এন্তাজ। তার বাড়িতে প্রবেশ করেছে ম্যালেরিয়ার নারকীয় স্পর্শ। নমঃশূদ্র পাড়ার অজস্র মানুষও উজাড় হয়ে গেল সেই ঝড়ে। কুইনাইনের অভাবে মানুষ আরও বেশি মৃত্যুর শিকার হল। উপযুক্ত ওষুধের অভাব ছিল সেই মারি ও মড়ক বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। কথাকার ননী ভৌমিক এ গল্পে এন্তাজদের জীবনধারায় সেই ঐতিহাসিক সত্যটিকেও বপন করতে চাইলেন। তবুও মৃত্যু ও মড়কের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে। খাদ্য ও ওষুধের অভাবে আর্থিক, শারীরিক ও সামাজিকভাবে বিপন্ন এন্তাজ। শারীরিক অসুস্থতায় ও নিতান্ত খাদ্যাভাবে তার জিভ একটু পানের আস্বাদ পেতে চায়। কিন্তু সেই ম্যালেরিয়া নামক মহা-মড়কের বিষবাষ্প স্পর্শ করে- এন্তাজের নাতি তথা এন্তাজের মেয়ে সায়েরার একমাত্র ছেলেকে। নিতান্ত খাদ্য ও ওষুধের অভাবে সেই শিশুটিরও মৃত্যু ঘটে। এই সায়েরা স্বামী-পরিত্যক্তা নারী। তখন দুর্ভিক্ষ-অনাহারের দিনে সমর্থ পুরুষরা নিজেদেরকে বাঁচাতে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন পরিত্যাগ ক'রে গ্রামান্তরী বা প্রবাসী হয়ে যেত। তখন আত্মরক্ষার তাগিদই মানুষের কাছে বড়। আসলে জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে মানুষ কতটা আত্মজীবন-পিপাসু ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায় তা গল্পকার দেখালেন। অর্থনৈতিক দুরবস্থা, খাদ্যের দাবি ও জীবনরক্ষার দায়ের কাছে মানুষ বড় অসহায়। সেখানে সমস্ত পরিচিত সম্পর্কসূত্রের

বন্ধনগুলো আলগা হয়ে পড়ে। যেমন তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' গল্পেও দেখি মানুষের আত্মরক্ষার দায়ই জয়ী হয়েছে সর্বাগ্রে। এই গল্পেও সেই ভাবনারই প্রতিফলন। আত্ম-জীবনপিপাসার কাছে সমস্ত আবেগ তুচ্ছ। মন্বন্তর মানুষের মনোলোকের এমন গভীর পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

'কাফের' গল্পে মড়কের পটভূমিতে সংযুক্ত হয়েছে মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের আখ্যানও। মানুষ যখন পরিস্থিতির কাছে অসহায়, মানুষ যখনই আত্মশক্তিতে পরাভূত; তখনই তাদের মধ্যে ঘনীভূত হয়েছে দৈববিশ্বাস। তা সে যে ধর্মেরই হোক। এই গল্পেও নমঃশূদ্রদের স্ত্রী দৈব স্বপ্নাদেশে গ্রামের উত্তরের ডোবাজলে তার স্বামীকে সিক্ত করিয়ে এনে তার রোগমুক্তি ঘটিয়েছে। তা থেকেই গোটা নমঃশূদ্র সমাজের এ বিশ্বাস বলিষ্ঠ হয়েছে। এইভাবে তারা মড়ক ঠেকাতে চেয়েছে। কিন্তু তারপরেও ম্যালেরিয়া ও অগুনতি মরণের প্রকোপ মানুষকে মৃত্যুবিভীষিকার অন্ধকার দেখিয়ে আতঙ্কিত করেছে –

> "মরিয়া হয়ে ভেঙে আসছে মানুষ। ভাল হবে না কি? মনে পাপ না রেখে পবিত্রভাবে ডুব দাও। ডুব দাও। যদি ভাল না হয় তাহলে যে আর কোনো আশাই নেই গো - কোনো আশাই নেই।"[১৪]

– এখানে একটি বিষয় বিশ্লেষিত হয়েছে - মড়ক কিন্তু হিন্দু-মুসলিম না মেনে নির্বিশেষেই আসে। জীবনের এই বাস্তব সত্যবোধটিকে লেখক রূপ দেন শৈল্পিক অভিধায়। নদীবাহী মানুষের মৃতদেহতে নারকীয় রূপ পরিগ্রহ করে রূপসী বাংলার হাজার হাজার গ্রাম। সেখানে পশু-মানুষে কোনো তফাৎ নেই। মানুষ পশুর মতো ম'রে পচছে –

> "গাঁয়ের শেষে জোলাদের বাড়ি ঢুকে আধ-মরা একটা লোককে কামড়ে কামড়ে খেয়েছে জঙ্গলের শেয়াল। দুটো মরা ছেলে সামনে নিয়ে তিন দিন ধরে একটানা কেঁদে যাচ্ছে নেওয়াজের বিধবা বৌ। গোর দেওয়ার লোক নেই কেউ।"১৫

–এমন যন্ত্রণাহত মুহূর্তেই তীব্র হয়ে ওঠে মানুষের বাঁচার আকাঙ্ক্ষা। মানুষ একেবারে প্রকৃতির কাছে, পরিস্থিতির কাছে অসহায় হ'য়ে দৈব-বিশ্বাসবোধকে আরো জাগ্রত করতে পারে মনের মধ্যে। তা সে হোক না কেন বিধর্মীয় সংস্কারবোধ! তাই এই গল্পের ইসলামধর্মীয় চরিত্র এন্তাজ নমঃশূদ্রদের বিশ্বাসবোধে ভর করে দৈব-নির্দেশিত ডোবায় স্নান করে পালাতে চেয়েছে মৃত্যুর কাছ থেকে। সেইজন্যই সে বলেছে –

> "চান কর্যা আলাম ওই ডোবাডায়, ওই ডোবাডায়; নমোদের অসুখ তো বালো অয় শুনি, আমার হোবে না ক্যান ?"১৬

–এখানে এন্তাজ মড়কপীড়িত পরিস্থিতিতে সর্বাত্মকভাবে বিপন্ন, অসহায়। তার চারদিকে ঘোরে শুধু মৃত্যুর প্রহরী। সে জীবনের পথে একেবারে দিশাহীন। মড়কদৃশ্য ও মৃত্যুপীড়িত পরিস্থিতিই তার জীবনপিপাসাকে বাড়িয়েছে। তাই সে স্বধর্মীয় সংস্কারবোধ ত্যাগ করে বিধর্মীয় সংস্কারের বিশ্বাসেও বাঁচতে চেয়ে 'কাফেরে' পরিণত হয়েছে। 'কাফের' একটি আরবি শব্দI 'কাফের' শব্দের অর্থ হল 'অবিশ্বাসী' বা 'অ-মুসলিম' বা 'ইসলামবিরোধী যে'। এখানে সে মড়কগ্রস্ত জীবনবৃত্তে, প্রাণের তাড়নায় তার স্বধর্মের কাছে 'কাফের'-এ পরিণত হয়ে গল্পের নামকরণকে ব্যঞ্জনাবহ করে তুলেছে।

'ধানকানা' (১৯৫৩) গ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'খুনীর ছেলে'। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহিমI সে খুনী ফিরিওয়ালার ছেলে। তাই সেই ক্রোধ ও মানসিক অসংযম তার জিনগত উত্তরাধিকার। তবু তার হৃদয়ে এক সকোমল অনুভূতির বাস। সে মালিক দিলুয়া তেওয়ারীর ঘোড়ার গাড়ীর চালক। সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে 'পক্ষিরাজ' নামের একটি ঘোড়াকে। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের গফুরের মতো এ গল্পের রহিমও নিজের সহৃদয় চেতনায় পক্ষিরাজকে আপন করে নিয়েছে। একটি মানবেতর পশুর সঙ্গে সহৃদয়তার আখ্যান নির্মিত হয়েছে রমেশচন্দ্র

সেনের 'সাদাঘোড়া', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী' ইত্যাদি গল্পেও। তবে এ গল্পের রহিম দেশজোড়া দুর্ভিক্ষের শিকার। মন্বন্তরপীড়িত সময় সেঁচে উঠে আসা চরিত্র সে। দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় মানুষের যন্ত্রণা এই গল্পের উপজীব্য। আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যসংকটে জেরবার রহিমেরা। চালের অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি ও সঠিক জোগানের অভাবে রোজকার করেও গলদঘর্ম হতে হচ্ছে তাদের। অথচ কিছু জোতদার, মহাজনদের অমানবিক পদক্ষেপই মহামারিকে যে ত্বরান্বিত করেছে এ গল্পেও সেই সত্য নিহিত–

> "জিনিসপত্তরের দাম বেড়েছে। দেশে লড়াই বাধলে নাকি দাম চড়ে যাবেই। চালাক ব্যবসায়ীরা টের পেয়ে মাল ধরে রাখে-..."১৭

–আর তারই প্রতিফল ভোগ করেছে রহিমের মতো অসহায় দীন-দরিদ্র মানুষ, আমজনতা। অথচ তারা অর্ধাহারে-অনাহারে থাকলেও, ঘোড়ার মালিক দিলুয়া তেওয়ারীর রহিমদের ওপর বহাল থাকে অর্থনৈতিক শোষণ। যা মহামারির প্রকোপকে আরো বেশি ত্বরান্বিত করে। অথচ দুর্ভিক্ষ ও মারির প্রাদুর্ভাবে এই ঘোড়াটির খাদ্যসংস্থানের প্রতিও তেওয়ারীর সজীব অবহেলা। যা রহিমের আবেগ ও স্থৈর্যকে আহত করে। সেইজন্য সে নিজের সর্বস্ব প্রতিরোধশক্তি দিয়ে প্রতিবাদীও হয়ে উঠতে চায়। অবশেষে তেওয়ারীর ঘোড়ার গাড়ি অন্তর্হিত হ'য়ে আসে সাইকেল-রিক্সা। বন্দোবস্ত হয় ঘোড়া তথা রহিমের আবেগ বিক্রির। ফলত দুর্ভিক্ষের কবলে কর্মচ্যুতও হয়ে পড়ে রহিমেরা। এইভাবে মন্বন্তর তাদের জীবনে এনে দিল এমন সীমাহীন অসহায়তা।

'খুনীর ছেলে' গল্পে কেবল রহিম ও পক্ষিরাজ একা নয়। দুর্ভিক্ষ ও মহামারিপীড়িত পরিস্থিতির শিকার হয়েছে রহিমের মতো অজস্র মানুষ ও তার চাচা। রহিমের চাচার জরাগ্রস্ততা তাকে শক্তিহীন করেছে। সে রহিমেরই অন্নজীবী। অথচ আকালের দিনে যেখানে রহিম আত্মজীবন রক্ষার্থেই ব্যর্থ, সেখানে এই বৃদ্ধর তার ওপর পরজীবিতা; রহিমের বড় বোঝা মনে হয়। অনাহার ও খাদ্যাভাবে কাতর হয়ে তার চাচা পক্ষিরাজের ছোলা খেয়ে নিলে, রহিমের মধ্যে ভর করে জান্তব ক্রোধ। তার ওপর ভর করেই রহিম তার মৃত্যুপথযাত্রী চাচাকে পথে ফেলে দেয়। চাইলে সে চাচাকে খুন করতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। কারণ সে চিনতে পেরেছে আসল শ্রেণিশত্রুকে। সমাজের ক্ষত ও দগ্ধতার স্থানটুকু তার নজর এড়ায়নি। সে একজন দরিদ্র অসহায় মানুষ হ'য়ে নিজের জীবনবোধ দিয়ে তা উপলব্ধি করতে পেরেছে–

"কেমন যেন টের পেয়েছে পক্ষিরাজের আসল দুশমন ও নয়। আর পক্ষিরাজের যে দুশমন, সেই তো ওরও দুশমন।"১৮

-আসলে তেওয়ারীর মতো শ্রেণিশত্রুরাই এই মারি ও মড়কের মূল কারণ; সে একথা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু খুনীর ছেলে রহিমের হাতে তার চাচার প্রাণরক্ষা হলেও, মহামারি কেড়ে নিয়েছে তার চাচার প্রাণ –

> "চৌমাথায় বড়ো মসজিদের দরজায় ফ্যান চাইতে চাইতে মরেছে ওর চাচা। লোকে বললে দুর্ভিক্ষ শেষ হয়ে গেছে, এবার মহামারী।"১৯

–প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফ্যান' কবিতাটি। এই গল্পেও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জীবনে নেমে আসা মারি ও মড়কের দৃশ্য ভয়াবহচিত্রে বর্ণিত হয়েছে এইভাবে। খাদ্যাভাবে পীড়িত হয়ে যদি মানুষ সে যন্ত্রণা সহ্য করে বেঁচেও যায়, তারপর সে আক্রান্ত হচ্ছে দুর্ভিক্ষের পরবর্তী অবস্থা– মহামারিতে। রহিমের মনে ঘনীভূত হয়ে ওঠা জমাট বাঁধা ক্রোধ দিয়ে সে বিনাশ করতে চেয়েছে শ্রেণিশত্রু তেওয়ারীকে। কিন্তু শেষ অবধি রহিমের প্রতিরোধী মানসিক শক্তি মুখ থুবড়ে পড়ে তার শারীরিক ক্লিষ্টতায়। দুর্ভিক্ষ, মারি ও মড়কগ্রস্ত পরিস্থিতি তার প্রাণশক্তিকে ভিতর থেকেই নিস্তেজ করে তুলেছিল রহিমের নিজের অজান্তেই। গল্পটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমালোচক বিনতা রায়চৌধুরী তার 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন-

"রসসিক্ত করে তুলেছেন।"

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শুকরা মুণ্ডা। দুর্ভিক্ষপীড়িত জীবন যাপনের রেশ তার চেতনায় কিছু একটা করার জন্য যেন আঘাত করতে চায়। চালের অগ্নিমূল্য শুকরাদের বেঁচে থাকা ও জীবনধারণকে পর্যুদস্ত করে। তার অভাবী জীবনের সঙ্গী তিন শিশুপুত্র ও সদ্যপ্রসূতি স্ত্রী মুংলী। ধানের পর মকাইয়ের ছাতুও শেষ হয়ে গিয়ে শূন্য পেটে দিনযাপন করে শুকরার পরিবারসহ বহু পরিবার–

> "অর্ধেক লোকের ঘরে এক কণা দানা নেই। ভুখা, স্রেফ ভুখা। হি হি করে কেঁপে বড় ছেলে দুটোর জ্বর এসেছে।"২৭

–অভাবের তাড়নায় শুকরা মুংলীকে পরিত্যাগ করে চলে যাবে– এই দুশ্চিন্তা তাড়া করে বেড়ায় মুংলীকে। সেই নিয়ে মুংলী যথেষ্ট আতঙ্কিতও। কিন্তু গল্পে শুকরাই শ্রমিকদের জীবনে প্রতিরোধের বারুদ জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে হাত মুঠো করার তেজ। সেই বারুদ বিস্ফোরণ না ঘটালেও ক্ষণিক ঝিলিকে তা জ্বলে উঠতে পারে। নিরক্ষর চা-শ্রমিকদের ওপর বাগানবাবুদের প্রবঞ্চনা একদিন গিয়ে সঞ্চিত হল শুকরার পেশিশক্তিতে। সে বাগানবাবুর গলার টুঁটি চেপে ধরে। অভুক্ত শ্রমিকরা সেদিন প্রতিরোধে ফেটে পড়েছিল। আর তারই প্রতিফল শুকরার প্রতি শারীরিক নির্যাতন ও হটাবাহার–

> "চাবুকের দাগে দাগে রক্তের সঙ্গে ছেঁড়া ফতুয়াটা কেটে বসেছে পিঠের ওপরে। কুঠি থেকে টলতে টলতে নেমে এল শুকরা। হটাবাহার ।"[২৮]

–'হটাবাহার' শব্দের অর্থ হল শুকরাকে এই বাগান থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। এখানে ব্রিটিশ সাহেবের নির্দেশানুসারে সে সমস্ত বাগানেই বহিস্কৃত শ্রমিক হয়ে থাকবে। জীবিকা অর্জন তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠবে। অথচ শুকরাদের সমস্ত শ্রমিকসমাজ যৌথভাবে পেশাত্যাগ ক'রে প্রতিরোধের আখ্যান রচনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু অর্থ যার, ক্ষমতা তার। 'হটাবাহার' হওয়া কুড়িজন শ্রমিক বাদে সকলেই সাহেবের ডাকে সাড়া দিল। আর তাদের হাঁড়িয়া, মাদক ও নাচ-গান উপহার দিয়ে সাহেব কূটকৌশলে ভুলিয়ে দিতে চাইল তাদের অন্নের দাবি ও প্রতিরোধের অগ্নিলিপিকে। এভাবে অসহায়, নিরন্ন মানুষ অর্থের কাছে বারবারই বশীভূত হয়ে যায়। আর ক্ষমতাভোগীরা চিরকালই সেই দারিদ্র্যকে টোপ হিসেবে গেঁথে, সেই সুযোগের অপব্যবহার ক'রে আত্মস্বার্থসিদ্ধির পথ নির্মাণ করে। তাই বকশিশের বাসনায় তাদের প্রতিরোধ-ইচ্ছা খানখান হয়ে যায়। তছনছ হয়ে পড়ে যূথবদ্ধ প্রতিবাদের মনোভাব। মাদক দিয়ে ভেঙে দিতে চাওয়া হয়েছে একঝাঁক শ্রমিকের সংঘবদ্ধতা। কারণ সাহেবরা জানত বারুদে-বারুদে বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী–

> "কুড়িজন বহিস্কৃত শ্রমিক দূর থেকে ওদের মাতলামি চেয়ে চেয়ে দেখে। ওরা সব ভুলে গেছে। হাঁড়িয়া ওদের সব ভুলিয়ে দিয়েছে।"[২৯]

দুর্ভিক্ষপীড়িত শুকরা একদিন সেই চায়ের দোকানের সমর্থ মেয়েটিকে সহসঙ্গিনী ক'রে পরিত্যাগ করল অথর্ব মুংলীকে। এখানে পড়ে রইল তার পরিত্যক্ত তিনপুত্র ও স্ত্রী মুংলী। কিন্তু সংঘবদ্ধ মানুষের পুনর্জাগরণ ঘটল একদিন। তারা বুঝতে পারল প্রশাসনের হিসেবী রাজনীতিটা। সেদিন তারা হাঁড়িয়ার বিপ্রতীপে ধানের দাবি জানিয়েছিল। পক্ষান্তরে ঐ 'হটাবাহার' হওয়া কুড়িটি পরিবারের ওপর নেমে এসেছে ব্রিটিশ প্রশাসনের নির্মম অত্যাচার–

> "বাঁকাচোরা ছনের চাল লাঠির ঘায়ে ভেঙে পড়েছে। নোংরা কাঁথা, কাপড়, মাটির হাঁড়ি, বেতের টুকরী টেনে এনে ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে ধুলোয়। ছড়ানো ছিটোনো জিনিসপত্রের ভেতর উজবুকের মতো বসে রইল কুড়িটা উদ্বাস্তু পরিবার।"[৩০]

–এমনকি মুংলীর সদ্যোজাত শিশুসন্তানের কচিহাত পিষ্ট হয়েছে চৌকিদারের বুটে। অবশেষে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে। শুকরা 'হটাবাহার' হ'য়ে চলে গেলেও তার দুচোখে জ্বালানো বিদ্রোহের আগুন সে

অন্য শ্রমিকদের চেতনায় জ্বালিয়ে দিয়েছে। পরাজয় অনিবার্য জেনেও তারা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে ফণা তুলেছে সমাজশত্রুর বিরুদ্ধে; যারা কেড়ে নিয়েছে এত কোটি মানুষের মুখের গ্রাস –

> "চায়ের পাতা না- টুকরী ভরে ভরে পাথর নিয়ে আসছে মেয়েরা। ...পাথরের চাঙ হাতে নিয়ে নিশ্চিত পদক্ষেপে টহল দিয়ে চলেছে আরণ্যক মানুষ।"[৩১]

–এভাবে শুকরার 'হটাবাহার' হওয়াকে কেন্দ্র করেই জেগে ওঠে মানুষের প্রতিরোধ। যে অভিব্যঞ্জনায় সার্থক হয়ে ওঠে গল্পের নামকরণও। তারা যেন প্রতিবাদ জানাতে চায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'বোধন' কবিতার ভাষায় –

> "শোন্ রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার!
> তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়-
> হিসাব কি দিবি তার?"[৩২]

-তবুও এই গল্পে শক্তি ও ক্ষমতার কাছে মুখ থুবড়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে অসহায়ের দুর্বল প্রতিরোধ। সে প্রতিরোধে স্বপ্ন আছে, কিন্তু সার্থকতার ভাষা নেই। তাই দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় চা-শ্রমিকদের জীবনে একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে যন্ত্রণা। এভাবে গল্পে দুর্ভিক্ষ তাদের মারি ও মড়কের দিকে ঠেলে দেয়। প্রসঙ্গত প্রাবন্ধিক ও সমালোচক মিহির আচার্যের এই উক্তি দিয়েই 'হটাবাহার' গল্পটির মূল্যায়ন করা চলে–

> "ননী ভৌমিক খুবই বস্তুবাদী লেখক ছিলেন। শ্রমিক-জীবন সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জানাশোনা আর দরদও ছিল।..... বাংলা সাহিত্যে তিনি একটা ধারা নিয়ে এসেছিলেন। একটা মৌলিক ধারা।"[৩৩]

–এইরেখায় 'হটাবাহার' গল্পটিতে উঠে এসেছে শ্রমিক জীবনের অব্যক্ত কান্না। গল্পটি হয়ে উঠেছে শ্রমিক জীবনের অলিখিত ইতিহাস। এই পথ ধরেই প্রান্তিক জীবনকে সাহিত্যে স্বতন্ত্র রূপ দিয়ে এক ভিন্ন সাহিত্য ধারা তিনি নির্মাণ করলেন। যে জীবন আলোড়িত হয়েছে পঞ্চাশের মারি-মড়ক ও মন্বন্তরের যন্ত্রণাকে সঙ্গী করেই।

গল্পকার ননী ভৌমিকের এই পাঁচটি গল্পের মতো অন্যান্য বহু লেখকের একাধিক সাহিত্যেই এই মন্বন্তর ও মারি-মড়কের যন্ত্রণার কাতররূপ পরিদৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত' (১৯৪৪), তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' (১৯৪৪), সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'কালো ঘোড়া' (১৩৫৩ ব.), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন্তামণি' (১৯৪৬), সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪), অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'আকালের সন্ধানে' (১৯৮২) ইত্যাদি উপন্যাসের কথা। এছাড়া মনোজ বসুর 'মন্বন্তর', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কেরোসিন', 'হাড়', প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায় কে বাঁচে', 'রাঘব মালাকার', 'দুঃশাসনীয়', সোমনাথ লাহিড়ীর '১৯৪৩', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আবরণ', 'রসাভাস', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পুষ্করা', 'নক্রচরিত', 'দুঃশাসন', নবেন্দু ঘোষের 'বাঁকা তলোয়ার', 'কল্কি', 'ত্রিশঙ্কু', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' ইত্যাদি গল্পেও এই মন্বন্তর ও মারি-মড়কের স্পর্শ নানা অনুষঙ্গে এসে হাজির হয়েছে। তাছাড়াও বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' (১৯৪৪), তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' (১৯৪৪), দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'দীপশিখা' (১৯৪৩) ইত্যাদি নাটকেও এই মারি-মড়কের অভিঘাত পরিলক্ষিত। সেই মহামারি ও মড়ক প্রভাবিত সাহিত্য-পরিমণ্ডলে কথাকার ননী ভৌমিকের গল্পগুলিও স্বতন্ত্র সংযোজন। যা বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় নিজস্ব ও মৌলিক শিল্পরসে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। মারি-সম্পৃক্ত সাহিত্যবৃত্তটি সম্পূর্ণ হবে না, ননী ভৌমিকের গল্পগুলি বাদ দিলে। বাংলা সাহিত্যের বৃত্ত-ব্যাসে ননী ভৌমিকের এই গল্পগুলির অবস্থান বুঝে নেওয়ার জন্যই এখানে উল্লিখিত হল প্রাসঙ্গিক ও সমান্তরাল সাহিত্যধারাটি। আমরা ননী ভৌমিককে বিস্মৃত হলেও সমকালকে অতিক্রম ক'রে তাঁর এই গল্পগুলি কালোত্তীর্ণ মর্যাদার দাবিদার।

সবশেষে ননী ভৌমিকের 'একটি দিন ১৯৪৪', 'কাফের', 'খুনীর ছেলে', 'কেলেপাথরী' ও 'হটাবাহার' - এই পাঁচটি গল্পের সামগ্রিক আলোচনায় বলতে হয়, সমস্ত গল্পগুলিই কোনো না কোনোভাবে মন্বন্তর ও মারি-মড়কের বৈচিত্র্যময় রূপের উপস্থাপন ঘটিয়েছে। যেখানে প্রায় সব গল্পগুলিতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সেই দুর্ভিক্ষ ও মড়কের কারণ এবং তার ভয়াবহতার ইতিবৃত্তটা। সেই ঐতিহাসিক তথ্যগুলিকে সঙ্গী করেই তাঁর এই গল্পগুলি সাহিত্যিক সত্যের ডানায় ভর করেছে। তারা গতিশীল হয়েছে শৈল্পিক মাধুর্যে। কখনো পরম সহানুভূতি ও কখনো তীব্র যন্ত্রণা, অসহায়তা বা নির্জীব ভয়াবহতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পগুলির কথাবস্তুটুকু। 'একটি দিন ১৯৪৪' গল্পে আলোকচিত্রীর মতো লেখকের খন্ড খন্ড কোলাজ নির্মাণ যেমন চিনিয়ে দিল সম-সময়ের আর্তধ্বনিটা, তেমনই লেখকের ব্যক্তিগত পেশাসূত্রে সাংবাদিকসুলভ সাহিত্যরচনার প্রয়াস এক ভিন্ন সাহিত্যসেতু নির্মাণ করল বটে। আবার অন্যদিকে 'কাফের' গল্পে মড়কের নারকীয় মঞ্চ ও মৃত্যুভয় অপসৃত করল মানুষের স্ব-ধর্মীয় সংস্কারবোধ। জন্ম হল নতুন বিশ্বাসের। 'খুনীর ছেলে' গল্পে রূপ পেল একটি দুর্ভিক্ষ-কবলিত পশুর প্রতি সখ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক নিজস্ব, নতুন অভিজ্ঞান। সে অভিজ্ঞানের নাম সঠিক শত্রুকে শনাক্তকরণ। 'কেলেপাথরী' গল্পে মারি-মড়কে হিংস্র হয়ে ওঠা মানুষের চণ্ডতা এক ভিন্ন শিল্পমর্যাদা পেল। আর সবশেষে 'হটাবাহার' গল্পে শ্রমিক জীবনের দুর্ভিক্ষ ও হাহাকারের ত্বরান্বয়ে প্রশাসনের কূটনৈতিক ভূমিকা। প্রতিটি গল্পই তার নিজস্ব অভিজ্ঞানে মারি-মড়কের ভিন্ন ভিন্ন রূপকে আমাদের কাছে চিনিয়ে দিয়ে গেল। এভাবে 'ধানকানা' (১৯৫৩) গল্পগ্রন্থের অর্ধসংখ্যক (পাঁচটি) গল্পের সমাহারে গ্রন্থটি যেন মন্বন্তর ও মড়কের এক শিল্পিত ঐতিহাসিক কড়চা রচনা করল। যেখানে গল্পগুলি কেবল দরিদ্র, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের অসহায় আখ্যান হয়েই আটকে থাকেনি; সেই আখ্যানের পিছনে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারময় ঐতিহাসিক সত্যটিও গল্পগুলিতে উঁকি মেরেছে কোনো না কোনোভাবে। 'ছোটগল্পের বিষয়-আশয়' গ্রন্থে সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তীর এই উক্তি দিয়েই ননী ভৌমিকের গল্পগুলির যথাযোগ্য মূল্যায়ন করা যেতে পারে–

> "মন্বন্তর সম্পর্কিত গল্পগুলি কিন্তু কেবলই অন্নহীনতার বা দারিদ্র্যের কাহিনি নয়। আসলে সেগুলি অত্যাচারের ইতিহাস। সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার উপনিবেশের প্রতি; প্রশাসনের অত্যাচার পরাধীন দেশের নাগরিকের প্রতি; সেই সঙ্গে জমিদার, জোতদার, কারখানা-মালিক তথা ধনিকশ্রেণীর অত্যাচার দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি।"[৩৪]

–এই কথাগুলি ননী ভৌমিকের আলোচিত গল্পগুলির ক্ষেত্রে বিশ্বস্তভাবেই সত্য হয়ে ওঠে। মারি-মড়কের সেই ঐতিহাসিক নির্যাসকে সাথে নিয়ে এই গল্পগুলি হয়ে ওঠে বিক্ষুব্ধ সময়ের নির্ভুল দস্তাবেজ।

পরিশেষে বলা যায়, ননী ভৌমিক মূলত চল্লিশের দশকের কথাকার। পঞ্চাশের অর্ধসময় জুড়েও ব্যাপৃত থেকেছে তার মসিশক্তি। তাঁর রচনায় অবহেলিত, শোষিত মানুষের কান্না নতুন করে ভাষা পায়। অর্থহীন উল্লাসে তারা কেবল মাথা খুঁড়ে মরে না। কখনো কখনো তারা ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখে। জীবনের বিপন্নতাকে অস্বীকার ক'রে তারা কখনো কখনো অস্তিত্বশীল হয়ে উঠতে চায় নতুন অভিপ্রায়ে। তারা চায় সংগ্রামী হয়ে উঠতে। হয়তো সে সংগ্রাম ও বিপ্লব শেষাবধি ব্যর্থতা ও অধিকতর যন্ত্রণার বিচারালয়ে মাথা খুঁড়ে মরে। তবু তারা কখনো কখনো ক্ষণিক প্রত্যয়েও প্রতিরোধী। এভাবে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বেদনগাথাকে অভিনব বাস্তবতায় তাঁর কথাসাহিত্যে রূপ দিলেন কথাশিল্পী ননী ভৌমিক। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক দেবেশ রায় তাঁর 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে' গ্রন্থের 'উপন্যাসে স্বদেশ জিজ্ঞাসা : ধুলোমাটি' নিবন্ধে বলেছেন-

> "পঞ্চাশের দশকে এমন যে-কজন গল্পকার ঔপন্যাসিক উপন্যাসে গল্পে বাস্তবকে তাঁদের লেখায় আনতে চেয়েছিলেন নতুন ভাষায় ও কল্পনায়, ননী ভৌমিক ছিলেন তাঁদেরও মধ্যে অন্যতম।"[৩৫]

–অর্থাৎ ননী ভৌমিকের 'বাস্তব' এক অভিনব স্পর্শে অভিসিঞ্চিত। যে রূপরেখায় মিশে থাকে এক স্বতন্ত্র 'Form' ও 'Content'-এর বয়ান। তাঁর গল্পের সংবাদসুলভ স্বতন্ত্র রীতিটিও বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষ নূতনত্বে অভিনন্দিত। এভাবে তাঁর মড়ক-পীড়িত গল্পগুলির 'বিষয়' ও 'রূপরীতি'র মধ্য দিয়ে ননী ভৌমিক হয়ে ওঠেন বাংলা ছোটগল্পের অভিনব সব্যসাচী। ননী ভৌমিকের মতো শক্তিশালী কথাকার যে বিস্মৃতির অতলে থেকে গেছেন, সে আক্ষেপ আমাদের। আমরা তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদায় চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে আনতে পারিনি। এ আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি। সেই দীর্ঘশ্বাস ও আক্ষেপের সারবত্তা ধরা পড়েছে প্রাবন্ধিক অমর দে'র 'সিউড়ি থেকে মস্কো' নিবন্ধে–

> "ভাবতে অবাক লাগে, মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পর যে-দুই সাহিত্যিক বঞ্চিত-লাঞ্ছিত নীচুতলার মানুষদের জীবন্তভাবে বাংলা সাহিত্যে এনেছিলেন, সেই ননী ভৌমিক ও সমরেশ বসু সম্পর্কে আমরা দু'রকম আচরণ করেছি। অথচ এঁরা দুজনেই বাংলা কথাসাহিত্যে দু'টি নতুন ধারা প্রবর্তন করতে পেরেছেন।"[৩৬]

–আসলে একটি গ্রথিত মালা থেকে একটি ফুল তুলে নিলে যেমন তা বেমানান হয়ে পড়ে, যেমন তা মালার সামগ্রিক সৌন্দর্যবোধের ছন্দপতন ঘটায়; ঠিক তেমনই বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণবৃত্ত থেকে বৃত্তচাপের একাংশকে মুছে দেওয়ার বা অস্বীকার করার অর্থই হল- সেই বৃত্তের সম্পূর্ণতা হারানো। আর কথাকার ননী ভৌমিক হলেন সেই পরিপূর্ণ বাংলা সাহিত্যবৃত্তের একটি বৃত্তচাপ। তাঁকে বিস্মৃত হওয়ার অর্থই হল একটি যুগের সময়স্পন্দিত অনুভব থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখা। সেই অপূর্ণ অনুভবে কোনো গৌরব নেই। মূলত উত্তরসূরিরাই একজন পূর্বসূরি লেখককে জীবন্ত রাখেন। ভাবীকালের লেখকরা তাঁর সৃজনের মধ্য দিয়ে যদি কোনো নতুন সৃষ্টির ইশারা খুঁজে পান - তবেই আমাদের এতদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। বিস্মৃতির পাপ ধুয়ে বাংলা সাহিত্যে স্মৃতির পুণ্যে উজ্জ্বল হোক ননীসাহিত্য। এ গৌরব সবচেয়ে বেশি আমাদের। এই মাঙ্গলিক উপাচারেই তো আমাদের বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার সর্বাধিক পুণ্যি! এই ব্রতেই বাংলা সাহিত্য আরো সমৃদ্ধ তপোফল লাভ করুক!

তথ্যসূত্র:

১। দাস, দিনেশ। 'ডাস্টবিন' কবিতা। দাস, দিনেশ। দিনেশ দাসের কবিতা। পাণ্ডুলিপি, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৫৮, কলকাতা, পৃ-৩৩।

২। মজুমদার, মানস। 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তর- চিত্র'। মুখোপাধ্যায়, তরুণ। সম্পাদনা। বাংলা ছোটগল্প। পর্ব-পর্বান্তর। অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা, পৃ- ১৬৮।

৩। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। 'সমকালীন লেখকদের ছোটগল্প'। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের পুত্তলিকা। দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৬, কলকাতা, পৃ-৩৭৬।

৪। দে, অমর। 'পত্রিকার কথা'। 'গল্পসরণি' পত্রিকা, ননী ভৌমিক বিশেষ সংখ্যা, পঞ্চদশ বর্ষ : বার্ষিক সংকলন, দীপাবলী, ১৪১৭/২০১০, কলকাতা, পৃ-গ।

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। 'স্মৃতির আলোয়'। 'গল্পসরণি' পত্রিকা, ননী ভৌমিক বিশেষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ-৫০২।

৬। দাস, দিনেশ। 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' কবিতা। নাসরিন, তসলিমা। সম্পাদনা। ফ্যান দাও। পুনশ্চ, সর্বাধুনিক সংস্করণ, ২০০১, কলকাতা, পৃ-৩৭।

৭। ভৌমিক, ননী। 'একটি দিন ১৯৪৪'। দে, অমর। সম্পাদনা। ননী ভৌমিক গল্পসমগ্র। গল্পসরণি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, বড়দিন, ডিসেম্বর ২০১০, কলকাতা, পৃ-২৫।

৮। তদেব, পৃ-৩২।

৯। তদেব, পৃ-৩৫।

১০। রায়চৌধুরী, বিনতা। 'গল্পসাহিত্যে পঞ্চাশের মন্বন্তর'। রায়চৌধুরী, বিনতা। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য। সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, কলকাতা, পৃ-৯৪।

১১। চট্টোপাধ্যায়, সাধন। 'বিস্মৃত লেখক ননী ভৌমিক। একটি প্রেমের গল্পের নিবিড় পাঠ'। 'গল্পসরণি' পত্রিকা, ননী ভৌমিক বিশেষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৫৭।

১২। দেবভূতি, অনন্যশংকর। 'বাংলা ছোটগল্পের সব্যসাচী ননী ভৌমিক'। 'গল্পসরণি' পত্রিকা, ননী ভৌমিক বিশেষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৬৫।

১৩। ভৌমিক, ননী। 'কাফের'। দে, অমর। সম্পাদনা। ননী ভৌমিক গল্পসমগ্র। প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮।

১৪। তদেব, পৃ-৪৬।

১৫। তদেব, পৃ-৪৭।

১৬। তদেব, পৃ-৪৭।

১৭। ভৌমিক, ননী। 'খুনীর ছেলে'। দে, অমর। সম্পাদনা। ননী ভৌমিক গল্পসমগ্র। প্রাগুক্ত, পৃ-৫৩।

১৮। তদেব, পৃ-৫৬।

১৯। তদেব, পৃ-৫৭।

২০। রায়চৌধুরী, বিনতা। 'গল্পসাহিত্যে পঞ্চাশের মন্বন্তর'। রায়চৌধুরী, বিনতা। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য। প্রাগুক্ত, পৃ-৯৬।

২১। ভৌমিক, ননী। 'কেলেপাথরী'। দে, অমর। সম্পাদনা। ননী ভৌমিক গল্পসমগ্র। প্রাগুক্ত, পৃ-৬৮।

২২। তদেব, পৃ-৬৯।

২৩। তদেব, পৃ-৭২।

২৪। তদেব, পৃ-৭৪।

২৫। ভৌমিক, ননী। 'হটাবাহার'। দে, অমর। সম্পাদনা। ননী ভৌমিক গল্পসমগ্র। প্রাগুক্ত, পৃ-১০৯।

২৬। তদেব, পৃ-১১০।

২৭। তদেব, পৃ-১১৩।

২৮। তদেব, পৃ-১১৬।

২৯। তদেব, পৃ-১১৭।

৩০। তদেব, পৃ-১১৯।

৩১। তদেব, পৃ-১২০।

৩২। ভট্টাচার্য, সুকান্ত। 'বোধন' কবিতা। ভট্টাচার্য, সুকান্ত। সুকান্ত-সমগ্র। সারস্বত লাইব্রেরী, পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৪০১, কলকাতা, পৃ-৬০।

৩৩। আচার্য, মিহির। 'ননী ভৌমিক সম্পর্কে দু'চার কথা'। 'গল্পসরণি' পত্রিকা, ননী ভৌমিক বিশেষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ-৫০৩।

৩৪। চক্রবর্তী, সুমিতা। 'বাংলা ছোটগল্প : স্রোতের সঞ্চয়'। চক্রবর্তী, সুমিতা। ছোটগল্পের বিষয়-আশয়। পুস্তক বিপণি, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০২১, কলকাতা, পৃ-৬০।

৩৫। রায়, দেবেশ। 'উপন্যাসে স্বদেশ জিজ্ঞাসা : ধুলোমাটি'। রায়, দেবেশ। উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে। দে'জ পাবলিশিং। দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৬, কলকাতা, পৃ- ১৬৩।

৩৬। দে, অমর। 'সিউড়ি থেকে মস্কো'। দে, অমর। সম্পাদনা। ননী ভৌমিক গল্পসমগ্র। প্রাগুক্ত, পৃ-৩।

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ:

১। ভৌমিক, ননী। ধানকানা। ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, প্রথম সংস্করণ, চৈত্র ১৯৫৩, কলকাতা।

২। মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ। পঞ্চাশের মন্বন্তর। বেঙ্গল পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৫১, কলকাতা।

৩। রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য। দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৮, কলকাতা।

৪। গোস্বামী, পরিমল। সম্পাদনা। মহামন্বন্তর। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৫৪, কলকাতা।

৫। রায়, অনুরাধা। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলার শিল্পসাহিত্য। অনুষ্টুপ, কলকাতা।

৬। চৌধুরী, বেলাল। সম্পাদনা। লঙ্গরখানা। পুনশ্চ, ১৯৯৪, কলকাতা।

৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপশ্রী ও বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিলা। বাংলায় মন্বন্তর। এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, ১৯৮৪, কলকাতা।

৮। ভট্টাচার্য, জগদীশ। আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী। ভারবি, ১৯৯৪, কলকাতা।

৯। দত্ত, বীরেন্দ্র। বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, ২য় খন্ড। পুস্তক বিপণি, অষ্টম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৮, কলকাতা।

১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৬, কলকাতা।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা:

১। ভট্টাচার্য, স্বাতী। 'সামনেই ভাত, তা বোঝার অবস্থা তার নেই'। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬, কলকাতা।

২। নন্দী, মতি। 'তিনি নেই, ধুলোমাটি থাকবেই'। 'আজকাল' পত্রিকা, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৬, কলকাতা।

৩। গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দন। 'সাহিত্যিক ননী ভৌমিক'। 'সংবাদ প্রতিদিন', মঙ্গলবার, ৩ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা।